তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

দৈনিক
ইত্তেফাক

ক্লাস বাদ দিয়ে ৫ম, ৮ম শ্রেণিতে বছরজুড়ে কোচিং

চলছে স্কুলঘরেও, নীতিমালা অমান্য

■ নিজামুল হক

অভিভাবকদের দাবির মুখে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যের রাশ টেনে ধরতে ২০১২ সালের ২০ জুন 'কোচিং বন্ধের নীতিমালা' জারি করে সরকার। কিন্তু এ নীতিমালা কাগজেই রয়ে গেছে। দেশজুড়ে চলছে কোচিং বাণিজ্য। অর্থের 'লোভে' অনেক শিক্ষক ভুলেও গেছেন নীতিমালা। আর এই নীতিমালা বাস্তবায়নে গঠিত মনিটরিং কমিটি নাম সর্বস্ব। কমিটির সদস্যরাও জানেন না কমিটি কী কাজ করছে।

২০১৩ সালে গোয়েন্দা সংস্থা রাজধানীর 'কোচিংবাজ' ৫শ শিক্ষকের তালিকা তৈরি করে। ওই তালিকা ধরে কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। ভিকারুননিসা নূন স্কুল, আইডিয়াল স্কুল ও মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে শো-কজ করা হয়েছিল। এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ। এরপর আর নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। অথচ নীতিমালা না মেনে কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কোনো শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকলে এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

ক্লাস বাদ দিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বেসরকারি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তির কথা বলা আছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, নীতিমালা না মানলেও শাস্তি পেতে হয় না। অভিভাবকরা বলছেন, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় কোচিং বাণিজ্য চলছে। লোক দেখানো এই নীতিমালা রেখে লাভ কার? প্রশ্ন অভিভাবকদের। এখন ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে নিয়মিত কোনো ক্লাস নেই, যা হচ্ছে তার পুরোটাই কোচিং। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভালো ফলের অজুহাতে বাধ্যতামূলক কোচিং করানো হচ্ছে। কোচিং ফি নির্ধারণ হচ্ছে ইচ্ছেমতো। এই কোচিং থেকে যা আসে তার পুরোটাই প্রতিষ্ঠান প্রধান ও জড়িত শিক্ষকরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন। আর নিয়মিত টিউশন ফি আদায় করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

নীতিমালা বলা হয়েছে, অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে শুধুমাত্র অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা ও উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে রশিদের মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা যাবে, যা সর্বোচ্চ ১২০০ টাকার বেশি হবে না। একটি বিষয়ে মাসে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে। সংগৃহীত ফি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণে একটি আলাদা তহবিলে জমা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সহায়ক কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ ১০ শতাংশ অর্থ রেখে বাকি টাকা নিয়োজিত শিক্ষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু নীতিমালার এ অংশও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কোচিংয়ের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দেড় থেকে ২ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া সবাইকে কোচিংয়ে বাধ্য করা হচ্ছে। আবার অনেক শিক্ষক স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে ব্যক্তিগত কোচিং ব্যবসা খুলেছেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে টাকা তুলে পুরো টাকা নিজেই আত্মসাত করছেন। আবার একটি অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে দিয়ে খুশি রাখছেন।

নীতিমালা বলা আছে, সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিয়ে দিনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সীমিতসংখ্যক (১০ জনের বেশি নয়) শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন। বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শতাধিক প্রতিষ্ঠানের খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে, নীতিমালার এ অংশও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। স্কুল শিক্ষকদের ব্যাচে পড়ানো বা প্রাইভেট টিউশনও বন্ধ হয়নি। স্কুলের এই কোচিং বাণিজ্যের বাইরেও শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বাসায় নিয়ে বা শিক্ষার্থী বাসায় গিয়ে পড়াচ্ছেন। এভাবে মাসে লাখ লাখ টাকা 'অনৈতিকভাবে' আয় করছেন। অভিভাবকরা বলেন, তারা ক্লাসে ভালোমতো না পড়িয়ে অথবা পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর দেয়ার প্রলোভনে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়তে আসতে উৎসাহিত করেন। ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ করা হলে কোচিংয়ের প্রয়োজন হতো না।

শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন 'ইত্তেফাক'কে বলেন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা কার্যকর করা প্রয়োজন। কার্যকরের জন্য গঠিত মনিটরিং কমিটি যাতে ঠিকমতো কাজ করে এ বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নেব, তাদের সাথে কথা বলবো। শিক্ষা আইনেও বিষয়টি থাকবে। আগামী এক মাসের মধ্যেই শিক্ষা আইন হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। আমরা আবার উদ্যোগ নেব, যারা নীতিমালা মানছে না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তিনি বলেন, শিক্ষা আইন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই আইন চূড়ান্ত হলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা আরো সহজ হবে।

কাজ করছে না মনিটরিং কমিটি

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা ঠিকমতো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটরিংয়ের জন্য পৃথক তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকায় ৯ সদস্য বিশিষ্ট, জেলা এবং উপজেলায় ৮ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক এ কমিটি গঠন করা হয়। মেট্রোপলিটন/বিভাগীয় এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভাপতি হবেন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক হবেন সদস্য সচিব। জেলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সভাপতি, জেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব হবেন। এছাড়া সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ এবং অভিভাবক সদস্য হিসাবে রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে এই কমিটি কোন কাজই করছে না।